সংবাদ

নাগরিক মঞ্চ

ই-পত্রিকা ১৫ ডিসেম্বর, ২০২১

সম্পাদকের কলম —

নাগরিক মঞ্চ প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই বন্ধ কারখানা খোলার দাবির পাশাপাশি কারখানার জমিতে পুনরায় শিল্প গড়ার দাবিতে সরব থেকেছে। এই বক্তব্যের স্বপক্ষে বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পের জমিতে শিল্পের হাল হকিকত নিয়ে সমীক্ষা, রিপোর্ট, কনভেনশন সরকারের কাছে দাবি সনদের মাধ্যমে তা তুলে ধরা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানার জমি অধিকাংশই সরকারের, যা শিল্প গড়ার শর্ত সাপেক্ষে মালিকরা নিয়েছিলেন। একইভাবে চা বাগানের জমি সরকার দিয়েছিলেন চা বাগান এবং চা তৈরির কারখানা গড়ার জন্য। ১৯৫৫ এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট এবং ল্যান্ড রিফর্ম অ্যাক্ট এর মাধ্যমে জমি মালিকরা পান।পরবর্তীতে কারখানা সংলগ্ন জমিতে অনেকক্ষেত্রে কারখানা বা বাগানের সম্প্রসারণ ঘটে। বলা যায় ১৯৮০ পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে রুগ্ন বন্ধ শিল্পের আধিক্য বাড়তে থাকে এর সঙ্গে শহর ও শহরতলিতে বাড়তে থাকে জমির দাম। রিয়েল এস্টেট ব্যবসার রমরমা শুরু হয়। নজর পরে বন্ধ ও রুগ্ন কারখানার জমির ওপর। ১৯৭০ পরবর্তী কংগ্রেস সরকারের শাসনকালে পূর্ব ভারতের বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পের পুনর্বাসনের লক্ষ্য নিয়ে গড়ে ওঠে আই আর সি আই সংস্থা যা নাম বদল করে পরে হয় আই আর বি আই। এই সংস্থার অধীনে ১২৪ টি শিল্পকে প্রাথমিক ভাবে অধিগ্রহণ করা হয় । এভাবেই রুগ্ন জুট মিলগুলি নিয়ে গড়ে ওঠে এন জে এম সি, এবং রুগ্ন টেক্সটাইল মিলগুলি নিয়ে গড়ে ওঠে এন টি সি। শিল্প পরিচালনায় অদক্ষতা, দুর্নীতি, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা, উৎপাদিত পণ্যের বৈচিত্র্যকরণ এসব সময়োপযোগী না হওয়ার কারণে সরকারের অর্থে প্রতিপালন ছাড়া এগুলিতে কিছুই ঘটে না। পুনরুজ্জীবিত হয়না। সরকার অধিগৃহিত এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব রুগ্ন শিল্প পুনরুজ্জীবন সাপেক্ষে ক্লোজার করার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯১ তে। তার পর থেকেই বলতে পারা যায় শিল্পের লিকুইডেশন এবং পরবর্তীতে আইনি এবং বেআইনি ভাবে বহু ক্ষেত্রে হাইকোর্টের চালু কারখানা হিসাবে খোলার নির্দেশ অমান্য করে বেআইনিভাবে বহুতলবাড়ি, শপিংমল, আবাসন প্রকল্প গড়ে তোলা হতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে আমাদের তথ্য অনুযায়ী ১২৭ টি শিল্প সংস্থায় শিল্পের জমিতে শিল্প গড়া হয়নি এবং সরকারি মতে যে জমি সরকারের ছিল সরকারের অনুমতি ছাড়া সেখানে বহুতল আবাসন বা শপিং মল অর্থাৎ শিল্প ছাড়া অন্য কিছু গড়ে উঠেছে। নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে ২০০০ থেকে ২০১০ পূর্বতন সরকারের কাছে এই বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার মন্ত্রী ও আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করে লিখিতভাবে রিপোর্টে বা দাবিতে জানানো হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার যাদবপুর জয় ইঞ্জিনিয়ারিং বা উষা কারখানায় সাউথ সিটি মল গড়তে অনুমতি দেন। একে একে বহু ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতি নিয়ে কাঁকুরগাছি তে স্মল টুলস কারখানায় প্যান্টালুন মল এর মত একাধিক জায়গায় শিল্পের জমিতে শিল্প ছাড়া অন্য কিছু হয়েছে। অথচ ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে বিধানসভায় পাস করা হলো ভূমিরাজস্ব আইনের সংশোধনী, আনা হলো ১৪ জেড ধারাটি যেখানে বলা হলো কোনো শিল্পসংস্থা বা চা বাগান বন্ধ বা রুগ্ন থাকলে শর্ত সাপেক্ষে সেই শিল্পের উদ্বৃত্ত্ব জমি সরকার অধিগ্রহণ অর্থাৎ পুনরায় ফিরিয়ে নেবে। যদি শিল্পটি পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনে বা শ্রমিকদের বকেয়া প্রাপ্য মিটিয়ে দেয়ার জন্য প্রয়োজন হয় তবে এই জমি নিলামে সর্বোচ্চ দামকারিকে দেওয়া হবে ফ্রি হোল্ড ল্যান্ড হিসাবে, যা এতদিন লিজ হোল্ড ল্যান্ড হিসাবে ছিল। এই আইনের পরেই আমরা তার প্রয়োগ দেখতে পাই হিন্দুস্থান মোটর, বাটা ইন্ডিয়া, ইস্টার্ন পেপার মিল, আমকো সহ শতাধিক সংস্থায়। সরকারি এই ছাড়ের সুযোগ নিয়ে উদ্বৃত্ত জমি কম দামে কিনে অনেক বেশি দামে বিক্রয় করা হয়েছে, শ্রমিকদের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার কথা বলে একটি ক্ষেত্রেও তা দেওয়া হয়নি। এভাবে সরকারি আইনসম্মত সমর্থন ও সুযোগ নিয়ে কয়েকশো কোটি টাকার মুনাফা করেছে বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পের সংস্থার মালিকরা। বিগত বামফ্রন্ট সরকার বা বর্তমান সরকার কেউই কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। প্রতিশ্রুতি ছিল রাজ্যে পালাবদলের পর অনুসন্ধান হবে, তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা হবে, শাস্তি হবে। না, কিছুই হয়নি। কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হুগলি, নদীয়ায় আজও সারি সারি বন্ধ ও রুগ্ন কারখানা – হাজার হাজার শ্রমিক কর্মহীন বেকার। ন্যায্য প্রাপ্য বকেয়াটুকুও পায়নি ক্ষতিপূরণ তো দুরস্ত। এই প্রেক্ষাপটে শ্রীরামপুরের বন্ধ টেক্সটাইল মিল যা এন টি সি ভুক্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অধিগৃহীত সংস্থা, সেটি সম্পর্কে প্রতিবেদনটি খুবই সাম্প্রতিক সময়োপযোগী একটি শিল্প ও মৃত প্রায় শ্রমিকের ধারাবিবরণী। এই ছবি শুধু হুগলির নয় দেশের সর্বত্রই, টেক্সটাইল মিল আধিক্য রাজ্য গুজরাট, মহারাষ্ট্র সবখানে।

নাগরিক মঞ্চের পক্ষে পবন মুখোপাধ্যায় (৯৮৩১৩১৮২৬৫) কর্তৃক ১৩৪ রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র রোড, ব্লক বি, রুম ৭, কলকাতা - ৮৫ থেকে প্রকাশিত
অলঙ্করণ: প্রিন্ট ডট কম, ৯৮৩০১৩৫৩৮৩

অট্টালিকার অন্তরালে জীবন যুদ্ধের কাহিনী

– অঙ্গনা ব্যানার্জ্জী

পি.এইচ.ডি রিসার্চ স্কলার, টাটা ইন্সিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্স, মুম্বাই

বন্ধ কারখানার জমিতে আবাসন এখন আর নতুন ঘটনা নয়। হুগলী নদীর দুধারে তাকালে কারখানার চিমনি অপেক্ষা উঁচু বহুতল আবাসন চোখে পড়ার মতন। শুধুমাত্র কলকাতা মহানগরী নয়, বিগত ১০-১২ বছরে শহরতলীগুলির বাহ্যিক পরিবর্তনও লক্ষণীয়। নগরায়ন নামক উন্নয়নের জোয়ারে শ্রীরামপুর, রিষড়া, কোন্নগর, হিন্দমোটর, ব্যারাকপুর আজ কংক্রিটের জঙ্গলে রূপান্তরিত হতে চলেছে। বহু জাতীয় এবং স্থানীয় স্তরের সংস্থা আজ এই সকল অঞ্চলে ক্রমাগত পুঁজি বিনিয়োগ করে চলেছেন আবাসন প্রকল্পে। এই নগরায়নের জোয়ার সীমিত থাকেনি শুধুমাত্র বড় মাপের জমিখণ্ডে, পুরানো বন্ধ কারখানার বিশাল ভূমিখণ্ডগুলিও আজ রিয়েল এস্টেট প্রকল্পগুলির শ্যেন দৃষ্টির কবলে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যেতে পারে হিন্দমোটর-এর মোটর কারখানার কথায়, যেখানে 'শ্রীরাম রিয়েলটি' নামক এক বৃহৎ দক্ষিণ এশিয় কোম্পানি প্রায় ৩০০ একর জমির ওপর নির্মাণ করছে একটি স্যাটেলাইট টাউনশিপ। শুধুমাত্র হিন্দমোটর নয়, নিকটবর্তী শহর শ্রীরামপুরও এর ব্যতিক্রম নয়। এই প্রবন্ধটির মাধ্যমে আমি কলকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি মফঃস্বল শ্রীরামপুর এবং সেখানে বন্ধ কারখানার জমিতে তৈরি হওয়া আবাসন প্রকল্প, শ্রমিক, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং শহরের চরিত্রবদল – এই বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

এখানে প্রশ্ন থাকতে পারে এত জায়গা থাকতে কেন শ্রীরামপুরকে আমি বাছলাম। এ বিষয়ে বলতে গেলে বলা যায় হুগলী জেলার অন্যতম প্রশাশনিক কেন্দ্র হল শ্রীরামপুর। এটি শ্রীরামপুর শিল্পাঞ্চল বলেও খ্যাত ছিল। ইতিহাসের পাতা ওলটালে জানা যায় যে প্রাচীন এই শহরে বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্প বর্তমান ছিল। এছাড়া দুটি বৃহৎ চটকলও এই শহরের বুকে প্রতিষ্ঠা হয়। পরবর্তীকালে এখানে তিনটি বৃহৎ সুতাকল যেমন রামপুরিয়া কটন মিল, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল এবং বঙ্গেশ্বরী কটন মিল ছিল অন্যতম। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে গ্লাস ও স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যাল এই অঞ্চলকে একটি শিল্পাঞ্চলের মর্যাদা দিয়েছে। এছাড়াও বেল্টিং এবং প্রিন্টিং কারখানাগুলিও ছিল উল্লেখ্য। যদিও বর্তমানে এই শিল্পগুলি প্রায় সবকটিই অবলুপ্ত। এর মধ্যে যেগুলি চলছে তাও ধুঁকছে। এই প্রবন্ধটিতে আমি এমনই কিছু রুগ্ন শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করব।

উত্তরপাড়া থেকে শ্রীরামপুরের দিকে যদি জি টি রোড বরারর এগিয়ে যাওয়া যায় তাহলে কিছু দুর অন্তর চোখে পড়বে অসংখ্য আবাসনের বিজ্ঞাপনের যা মধ্যবিত্তের সাধ্যের মধ্যে সাধ পূরণের কথা বার বার তুলে ধরে। তাছাড়া শুধুমাত্র বিজ্ঞাপন নয়, শহরতলির রূপ যেন অচেনা। অপেক্ষাকৃত চওড়া রাস্তা, আলো, বড় বড় দোকান, শপিং মল এবং উঁচু অট্টালিকা যেন শহরতলির রূপ সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। স্থানীয় কাউন্সিলর এর ভাষায় 'শহরতলীর উন্নয়ন' যেন চোখে পড়ার মতন। এক ঝলকে দেখলে এই সকল অঞ্চল কলকাতার আলিপুর বা ভবানিপুরের থেকে চাকচিক্যে কোনও অংশে কম নয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায় ''এখন আর যানবাহনের

ওপরে নিউ কোলকাতা ও নিচে সোলারিস সিটির বিজ্ঞাপন

মধ্যবিত্তের স্বপ্ন পূরণের অঙ্গিকার

সমস্যা নেই। অটো, টোটো এখন অনেক রাত অবধি পাওয়া যায়। এ আমাদের নতুন কলকাতা"। সত্যি, এ যেন আমার চেনা শহর না, চাকচিক্কের নিরিখে সত্যিই এই শহর আজ কলকাতা মহানগরীকে টেক্কা দিতে চলেছে।কিন্তু এই আলোর আড়ালে যে কত মানুষের মাথার ঘাম, চোখের জল রয়ে গেছে তার হিসাব হয়ত কেউ রাখে না।

পুরানো সেই দিনের কথা

আজ যেখানে ''নিউ কলকাতা'' প্রোজেক্ট, সেখানেই ছিল ঐতিহ্য মণ্ডিত বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল। এটি প্রাচীনতম মিলগুলির মধ্যে অন্যতম। ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই মিলটির অবদান উল্লেখ্য। ১৯০৮ সালে এই মিলটিতে ২০০ টি লুম এবং ২৬০০০ স্পিন্ডল ছিল। মিলটিতে ১৯৫৯ সালের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৩,০২৯ জন শ্রমিক কাজ করতেন । ২০০৩ সাল নাগাদ মিলটি পুরোপুরি ভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

শুধুমাত্র বঙ্গলক্ষ্মী নয়, আরও একটি প্রোজেক্ট উল্লেখ্ যোগ্য তা হল ' সোলারিস সিটি' যা তৈরি হচ্ছে রামপুরিয়া কটন মিলের জমিতে। এখানে প্রায় ২,৫০০ শ্রমিক কাজ করতেন। মিলটিতে অর্থনৈতিক এবং আভ্যন্তরীণ নানা কারণে উৎপাদন ক্রমশ কমতে থাকে এবং মোটামুটি ১৯৭৪ সাল নাগাদ বন্ধ হবার সূত্রপাত হলেও মধ্যে মিলটি খোলে ও উৎপাদন কম হলেও চলতে থাকে। পাকাপাকি ভাবে ২০০৩ সালে মিলটি বন্ধ হয়ে যায়। অথচ এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের মুখে শোনা যায় এই মিলটি থেকে কারখানার মালিক আরও অনেকগুলি কারখানা করেছিলেন।

উপরোক্ত দুটি মিলই ছিল শ্রীরামপুর সংলগ্ন মাহেশ এলাকায়। মিল দুটি চালু থাকাকালীন এই অঞ্চলের রমরমা অবস্থা ছিল বলে জানান এলাকার প্রাচীন অধিবাসীরা। সপ্তাহান্তে হাট বসত এবং সেই হাটে সকল রকমের জিনিষ পাওয়া যেত। পাশের শহরতলী থেকেও লোকে আসতেন এই হাটে। স্বাভাবিক ভাবেই এই দুই কারখানা ঘিরেই অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল বাজার ও দোকান। এছাড়াও এখানে কারখানার কারণে নানান ভাষার লোকের সহাবস্থান ছিল। অধিবাসীদের কথায়:

"কী দিন ছিল সেই সময়! যাকে বলে সোনার দিন। যখন কারখানার ভোঁ বাজত পুরো জি টি রোড-এ জ্যাম হয়ে যেত। শিফট বদলির সময় হাজার হাজার শ্রমিক সাইকেল নিয়ে কারখানায় প্রবেশ করত এবং বেরোত । বড় বড় গাড়ি দাঁড়িয়ে যেত প্রায় এক ঘণ্টার জন্য''।

তাদের কথায়, ''এই কারখানা ছিল আমাদের গর্ব। কাপড়ের গুণমান অত্যন্ত ভাল ছিল এবং বাজারে এর চাহিদা ছিল বেশ ভাল। এই কারখানার ওপর ভিত্তি করেই দুবেলা খেয়ে পরে সুখে শান্তিতে আমরা বেশ ছিলাম।"

যে জায়গার পরিচিতি ছিল সুউচ্চ চিমনী, আজ যখন সেই রাস্তা পার হয়ে চলেছি চোখে পড়ছে সুউচ্চ আবাসন। আগে যে রাস্তায় দলে দলে সাইকেল নিয়ে ছিল শ্রমিকের যাতায়াত, আজ সেখানে চার চাকা গাড়ীর ঘন ঘন যাতায়াত চোখে পড়ার মত। রাস্তার দুধারে আবাসনের হোর্ডিং আর এল ই ডি লাইটের চাকচিক্য হয়ত বাহ্যিকভাবে অঞ্চলটির পরিবর্তন এনে দিয়েছে কিন্তু এই পরিবর্তন কতটা অঞ্চলের বাসিন্দাদের ওপর, এলাকার অর্থনীতির ওপর এবং সর্বোপরি শ্রমিকদের ওপর প্রভাব এনেছে তা পরবর্তী অংশে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

সোনার সিটি - সোলারিস সিটি !

সোলারিস সিটির পাঁচিলের ঠিক উল্টোদিকে কতগুলি ঝুপড়ি ঘরের সামনে একটি গাছের নিচে বসে রয়েছেন একজন অশীতিপর বৃদ্ধ। বয়সের ভারে চলার ক্ষমতা নেই। চোখে ছানি পড়েছে তবুও মিল-এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তার চোখ যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কাঁপা গলায় জানালেন তিনি এবং তাঁর বাবা এই দুই প্রজন্মই কাজ করেছেন এই মিলে। চোখের সামনে কিভাবে মিল বন্ধ হয়ে গেল আর তার জায়গায় কালের নিয়মে আস্তে আস্তে তাদের রুজি রোজগারের একমাত্র উৎসস্থল হয়ে উঠল আবাসন তা তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। এই পরিবর্তন যে খুব একটা আশু তা তিনি মনে করেন না কারণ তাঁর মতে ''*ইয়ে ঘর কউন খরিদেগা? পয়সেবালোঁ কে লিয়ে ইয়ে বনা*'' তিনি আরও বলেন ''*আগর ফ্যাক্টরি চালু রহেতা কাম কাজ মিলতা। লড়কে লোগ শান্তিসে খা পি কর জিতা, ইয়ে তো কুছ কাম কা নাহি*''। সিং জির মতে ''*ফ্যাক্টরি ল্যান্ড পে ফ্যাক্টরি হি বননা চাহিয়ে*''।

শুধুমাত্র সিং জি নন কিছুটা একই কথার আভাস পাওয়া গেল সেনবাবুর কথায়। তিনিও এই কোম্পানিতে কাজ করেছেন বিগত ২০ বছর। এই কোম্পানি বন্ধ হওয়ার পিছনে তিনি মালিক পক্ষের শরীকি ঝামেলার কথা উল্লেখ করেছেন। এই ঝামেলার কারণে মিলগুলি মাঝে মাঝে বন্ধ হতে থাকে অর্থাৎ, মিলগুলির অনিয়মিত উৎপাদন এর মুনাফার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু এই মিল ছিল এন টি সি-র অধীন সুতরাং, ক্রমশ কম উৎপাদন, শরীকি অন্তর্দ্বন্দ্ব, ইউনিয়ন-শ্রমিক দ্বন্দ্ব এবং ইউনিয়নের অসাধু হস্তক্ষেপ প্রভৃতি কারণে মিলটি ২০০৩ সালে লক আউট হয়ে যায়। এন টি সি-র অধীন হওয়ার সুবাদে কর্মরত শ্রমিকদের বদলি করা হয় নিকটবর্তী দাশনগরের আরতি কটন মিল এবং রিষড়ার লক্ষ্মী নারায়ণ মিল-এ। আশ্চর্য জনকভাবে এই সকল কর্মচারীদের ২০০৯ সালে বহিষ্কার করা হয় এবং অবসর নিতে বাধ্য করা হয়। অর্থাৎ এই মিলে আর কোনো স্থায়ী কর্মী থাকল না, রইল কেবল অস্থায়ী কর্মী। ফলে অর্থনৈতিক সকল দায়দায়িত্ব থেকে কোম্পানি মুক্তি পেল। সেনবাবুর মতে ''*শ্রমিকের স্বার্থ কোনভাবে মিল মালিক দেখল না। শ্রমিকই কাজ হারাল । খাতায় কলমে তার কাজের বদলি হলেও বাস্তবে সে কর্মচ্যুত হল।*'' তাঁর কথায় "*যে*

কারখানা থেকে মালিক তার এত রমরমা করল, সেই কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়ে অঞ্চলটির অর্থনীতি পুরোপুরি ধ্বসিয়ে দিল।"

বর্তমানে সোলারিস সিটি প্রোজেক্ট প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন "এই প্রোজেক্ট ২৩ একর জমির ওপর দাঁড়িয়ে"। সুতরাং একসাথে এত জমি পাওয়া সম্ভব হয়েছে বলেই এখানে এমন এক শহর গড়ার কথা ভাবা গেছে। তবে তাঁর কথায় "এই প্রকল্প উচ্চ মধ্যবিত্তের কথা মাথায় রেখে তৈরি। যদিও রাস্তায় এই প্রকল্পের বিজ্ঞাপনে বার বার "সাধ্যের মধ্যে সাধ পূরণের স্বপ্ন" বলা হচ্ছে, সেনবাবু জানান, এখানে বিনিয়োগ করছে মূলতঃ উচ্চবিত্তরা। কারও কাছে এটি দ্বিতীয় গৃহ যা হয়ত একটি ইনভেস্টমেন্ট মাত্র। কিন্তু বাস্তবে নিম্নবিত্তের যে গৃহের চাহিদা তা এই প্রকল্প কতটা বাস্তবায়িত করছে তা বিবেচ্য বিষয়।

এ যেন এক নিউ (নতুন) কোলকাতা!

মফঃস্বলে এই প্রথম দেখা মিলল জি১৭ অর্থাৎ ১৮ তলা

প্রবেশ পথঃ সোলারিস সিটি, শ্রীরামপুর

আবাসন নির্মাণ চলছেঃ সোলারিস সিটি, শ্রীরামপুর

আবাসনের। শুধুমাত্র তাই নয় কমিউনিটি হল, জিম, প্লে এরিয়া, সুইমিং পুল তো রয়েছেই, সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল প্রাইভেট জেটি যার সাহায্যে পৌঁছে যাওয়া যাবে হাওড়া পর্যন্ত। এ যেন এক নতুন কোলকাতা! পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। আগে যেখানে প্রায় ৩,৫০০ শ্রমিক তিন শিফটে কাজ করতেন, আজ সেই জায়গায় তৈরি হচ্ছে হুগলী জেলার অন্যতম বৃহৎ আবাসন প্রকল্প।

এই বিশাল আবাসন নির্মাণের কর্মযজ্ঞ পরিদর্শন করতে করতে হঠাৎ দেখা মিলল 'বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল সংগঠন (সি আই টি ইউ)" এর। সেখানেই পেয়ে গেলাম রায়বাবুকে যিনি ছিলেন এই মিলটির সাথে যুক্ত। শুধুমাত্র তিনি নয়, তাঁর পিতা ছিলেন এই মিলের ইঞ্জিনীয়ার এবং তিনিও কাজ করতেন এই মিলে। অনেক আগে মিলটি সম্পূর্ণ প্রাইভেট থাকলেও পরবর্তীকালে এটি অধিগ্রহন করে এন টি সি। তাঁর কথায় "শ্রমিকরা সবসময় চায় তাদের রুটিকে বাঁচাতে। কিন্তু প্রচার হয়েছিল শ্রমিকরা কাজ করতে চায় না। অর্থাৎ শ্রমিকদের কাজ করতে না চাওয়ার মানসিকতাকে হাতিয়ার করে ক্রমশ মিলটিকে রুগ্ন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়। তিনি আরও জানান প্রথমে মিলটিতে সুতো থেকে কাপড় তৈরি, এই সম্পূর্ণ কাজ হত কিন্তু ক্রমশ তা দাঁড়ায় শুধুমাত্র স্পিনিং এ। কালের গতিতে উৎপাদন কমতে থাকে এবং এমন একটা সময় এসে পড়ে যখন কাঁচামাল এসে না পৌঁছানোর দরুণ শ্রমিক উৎপাদন করতে পারে না এবং ফলস্বরূপ, তাদের মধ্যে কাজ ফাঁকি দেওয়া, জুয়া, তাস প্রভৃতি খেলার প্রবণতা দেখা যায়। এভাবে মিলটি ক্রমশ রুগ্ন শিল্পের আখ্যা পায় এবং কোম্পানির সমস্ত যন্ত্রপাতি লোহার দরে বিক্রি হয়ে যায়। মূলত এন টি সি-র আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব অনেকাংশে মিলটিকে দুর্বল করে দেয়। অথচ বাইরে এন টি সি-র শ্রমিকদের নামে কাজ না করার মানসিকতার অপপ্রচার চলতে থাকে। এভাবেই মিলটি ক্রমশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। ২০০৩ সালে প্রায় ৮০০-৯০০ শ্রমিক কাজ করতেন এবং সেই অবস্থায় মিলটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। ফলস্বরূপ কিছু কর্মচারী ভি আর এস নিতে বাধ্য হন এবং এই অবস্থায় শ্রমিকরা তাদের পাওনা বুঝে নিতে সচেষ্ট হন। সেরকমভাবে মিলটি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা বা প্রতিবাদ লক্ষ্য করা যায় না। এক্ষেত্রে শ্রমিকরা তাদের বকেয়াটুকু পান বটে, তবে পুনঃ কর্মসংস্থানের জন্য সেরকম ভাবে কোনও আন্দোলন দানা বাঁধে না।

বর্তমানের নিউ কোলকাতা প্রোজেক্ট সম্পর্কে তিনি এবং অঞ্চলের কিছু অধিবাসী জানান "এ প্রোজেক্ট সাধারণ মানুষের জন্য নয়"। গঙ্গার সৌন্দর্য, আবাসনের সুযোগ সুবিধা উপভোগ করতে কিছু মানুষ এখানে ঘর নিয়েছেন বটে, তবে কোনভাবেই এই প্রকল্প সাধারণ মানুষের চাহিদা পুরণ করতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গে শিল্প যে মৃতপ্রায় এবং শিল্পের বিশাল ভূমিখণ্ডের ওপর আবাসন যে কোনোভাবেই শ্রমিক উন্নয়নে কোনও ভুমিকা রাখে না তা বারবারই

সাধারণ মানুষের কথায় ফুটে ওঠে। মিলগুলি আজ সচল থাকলে বর্তমান তরুণ প্রজন্ম নিশ্চিন্তে অন্নের যোগান পেত, প্রতিবেশী রাজ্য বিহার, ওড়িশা, উত্তর প্রদেশ থেকে ছুটে আসা শ্রমিক যারা গৃহহীন হয়েছিল কটন মিলে কাজের আশায়, তারা কাজ পেত। শুধুমাত্র মিল নয়, মিলকে কেন্দ্র করে নির্ভরশীল ব্যবসা, ক্ষুদ্রশিল্প গুলিও আজ সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে পারত।

নিউ কোলকাতা প্রোজেক্ট (১)

নিউ কোলকাতা প্রোজেক্ট (২)

নিউ কোলকাতা প্রোজেক্ট (৩)

নিউ কোলকাতা প্রোজেক্ট (৪)

এ পথে লাভ কার?

নগরায়নের উন্মত্ততায়, উন্নয়নের মোড়কে শিল্পের জমিতে আবাসন পক্ষান্তরে কতটা লাভজনক তা বারে বারে প্রশ্নের উদ্রেক করে। শ্রমিক, কর্মচারী বা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের কথায় এই উন্নয়ন যে অর্থনীতির উপর সুপ্রভাব ফেলছে না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যেসকল প্রশ্ন ও পর্যবেক্ষণ উপলব্ধ বা অনুভূত হয়েছে তা একত্রীকরণ করলে বলা যায়ঃ

- শিল্পের জমিতে শুধুমাত্র শিল্পকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

- শিল্পের জমিতে আবাসন পক্ষান্তরে ভবিষ্যৎ শিল্পের সম্ভাবনাকে সমূলে উৎপাটন করে এবং শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটে।

- বিকল্প কর্মসংস্থানের অভাবে বহু শ্রমিক পরিব্রাজন করতে বাধ্য হয়, অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

- ভি আর এস পক্ষান্তরে শ্রমিকের আর্থিক ক্ষতি ডেকে আনে যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে তাদের কাজ করার সুযোগ বিনষ্ট হয়।

- অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক কারখানা আংশিক বন্ধের কারণে তার বকেয়া অর্থ পায় না। ফলে তাকে ধার দেনার সম্মুখীন হতে হয় যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের জীবনে চিরদারিদ্র্য ডেকে আনে।

- এন টি সি রুগ্ন শিল্পকে বাঁচাতে তার যথাযথ ভুমিকা নেয় নি।

- রুগ্ন শিল্পকে বাঁচাতে রাজ্য সরকার এবং আই ডি বি আই কর্তৃক যৌথ ভাবে ঋণ প্রদান ও কর মকুবের যথাযথ ভুমিকাকে আরও গুরুত্ব প্রদান প্রয়োজন।

- কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭১ এর সংশোধনী অনুযায়ী ইন্ডাস্ট্রীজ অ্যাক্ট (ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেশন) ১৯৫১ এর সঠিক পুনর্বিবেচনা করবেন এবং রুগ্ন শিল্পের ওপর জোর দেবেন।

- শিল্পের রুগ্নতার কারণগুলির সঠিক পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা অত্যন্ত আবশ্যক।

- ‘পশ্চিমবঙ্গ শিল্প পুনরুজ্জীবন স্কীম, ২০০১ এর ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান আবশ্যক।

- বৃহৎ উল্লম্ব আবাসন প্রকল্প অঞ্চলের ওপর অধিক জনসংখ্যার চাপ বাড়ায় এবং তা জনঘনত্ব বাড়িয়ে তোলে।

- বর্ধিত জনঘনত্ব পক্ষান্তরে শহরের পরিষেবা প্রদানে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং শহরের শাসনের পথে চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে।

ওপরে উল্লিখিত বিষয়গুলি থেকে অনুমান করা যায়, আবাসন কোনও ভাবেই অর্থনীতির ভীত সুদৃঢ় করে না বরং তা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে সমূলে উৎপাটিত করে। আবাসন প্রকল্প গুলি সরকার, শিল্পপতি এবং কিছু মুষ্টিমেয় শ্রেণীর হাতে এককালীন কিছু মুনাফা এনে দেয় ঠিকই কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতে তা কখনই স্থায়ী সমাধান নয়। এই প্রকল্পগুলি আমাদের কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে; তবে কি এই অট্টালিকাসম আবাসন আসলে এই অঞ্চলের শ্রমিক শ্রেণী তথা নিম্ন বিত্তের কাছে সার্ভিস এরিয়া হিসাবে থাকবে যেখানে সিকিউরিটি গার্ড বা গৃহস্থালির কাজে সহায়ককারী হিসাবেই তাদের জীবন চলবে? নাকি এই অঞ্চলে বসতি স্থাপনের ফলস্বরূপ দোকান বা ছোট খাট ব্যবসা, অস্থায়ী কাজ, রিক্সা বা টোটো চালক ইত্যাদি অঞ্চলের অর্থনীতি সুদৃঢ় করবে এখন তা কেবল দেখার অপেক্ষা।

নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় রিসোর্স সেন্টার গড়ে উঠেছিল প্রায় পঁচিশ বছর আগে। Covid জনিত কারণে প্রায় দশমাস বন্ধ থাকার পর এখন আবার কাজকর্ম শুরু হয়েছে। এখানে আছে শ্রম, শিল্প, পরিবেশ, অর্থনীতি, রাজনীতি নিয়ে সরকারি এবং বেসরকারি নানান বই-রিপোর্ট-তথ্যের ভান্ডার। প্রয়োজনে যোগাযোগ করে ব্যবহার করতে পারেন। নাগরিক মঞ্চ ১৯৮৯ থেকে আজ পর্যন্ত সরকারি বেসরকারি কোনো ধরনের ফান্ডিং এজেন্সির সাহায্য না নিয়ে কেবলমাত্র সহযোগী বন্ধুদের আর্থিক সহায়তার ওপর ভরসা করেই এই ৩৩ বছর ধরে চলছে। শ্রমিকদের মধ্যে সমীক্ষা, বই প্রকাশ, ওয়েবসাইট, পত্রিকা প্রকাশ, আলোচনা সভার আয়োজন এই ধরণের কাজ এখনো একইভাবে চলছে। আমাদের সাথে যুক্ত হোন, পরামর্শ দিন এবং সহযোগী বন্ধু হোন। আপনার আর্থিক সহায়তা নাগরিক মঞ্চের কাছে অত্যন্ত জরুরি।